হৈরে বাবুই হৈ
অন্নদাশংকর রায়

'তেলের শিশি ভাঙলো বলে/খুকুর' পরে রাগ করো/তোমরা যে সব বুড়ো খোকা/ভারত ভেঙে ভাগ করো'—আধুনিক কালের এই বিখ্যাত ছড়াটির রচয়িতা কে, অনেকেই হয়তো চট করে তা মনে করতে পারে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও, 'ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়লো/বর্গি এলো দেশে' কিংবা 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে/কদমতলায় কে'র মতো প্রাচীন ছড়াগুলির সঙ্গে এটিও তাদের সকলের মুখে মুখে ফেরে। স্রষ্টার নাম যখন গৌণ হয়ে গিয়ে কোনও ছড়া আবালবৃদ্ধ সকলের মুখে স্থান পায় তখনই ছড়া হিসেবে সেটি সার্থক—বোঝা যায়। এমন সার্থক ছড়া লেখেন বা লিখতে পারেন একালে মাত্র একজনই। তিনি অন্নদাশংকর রায়। লোকের মুখে মুখে ফেরার মতো তাঁর আরও অনেক ছড়া—'আধ মন চাল তার/এক থালা ভাত/কে খায়? কে খায়?/কৈলাসনাথ'; 'ক' রে, তোরা ক'!/শুধান তিনি, বর্ণমালায়/ক'টা আছে স?'; 'মুনু মুনু মুনিয়া/শিকারী নয় গো ওরা/ওই সব খুনিয়া'; 'খেলবো না তো গোলামচোর/সবাই তোরা চালাক ঘোর'; 'বিজলীর ধারা এই/এই আছে এই নেই' প্রভৃতি—নিয়ে বেরোলো এই নতুন ছড়ার বই 'হ রে বাবুই হৈ'। প্রতিটি ছড়ার সঙ্গে আছে এক বা একাধিক মন-ভোলানো রঙিন ছবি—নাম-করা আঁকিয়ে অহিভূষণ মালিকের আঁকা॥

....

৮·০০

....
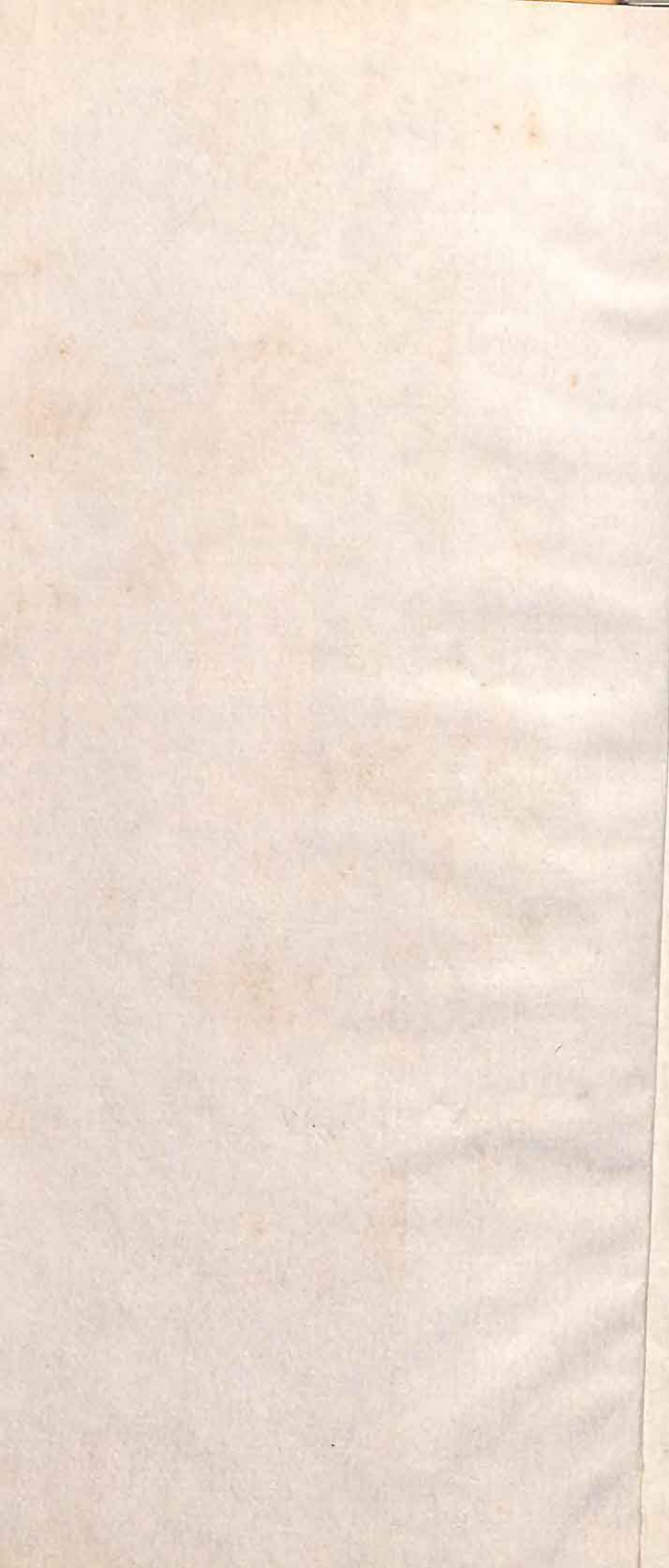
হেরেবাবুই হৈ

অন্নদাশংকর রায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৯

উৎসর্গ

ঋতুপর্ণা

বর্ণিনী

আদিত্যবর্ণ

শরণ্য

তোমাদের
দাদু

'হৈ রে বাবুই হৈ
রাঙা ধানের খৈ।'

লাল টুক টুক

লাল টুক টুক ছাতাটি
কালো কুচ কুচ মাথাটি
কে যায়? কে যায়?
সোনা রায়।

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপ
পথ চলতে মজা খুব
কে পায়? কে পায়?
সোনা রায়।

ওদিকেতে পা দুটি যে
জলের ছাঁটে গেল ভিজে
ফিরে আয়! ফিরে আয়!
সোনা রায়।

(১৯৭৩)

জলসা

ওই দ্যাখ, আসছেন রুরু
এইবার নাচ হোক শুরু।
রুরুবাবু নাচছেন
ঘুরে ঘুরে নাচছেন
সুরে সুরে নাচছেন
তালে তালে নাচছেন
তাক তাক ধিন ধিন
ধিন ধিন তাক
রুরুবাবু খান ঘুরপাক।
তারপর পড়ে যান ধপাস্।
সাবাস্! সাবাস্!

ওই দ্যাখ, আসছেন বিবি
তোরা সব গান জুড়ে দিবি।
হাম্পটি ডাম্পটি
স্যাট অন এ ওয়াল
লে আও ঢাল আর
লাও তরোয়াল।
হাম্পটি ডাম্পটি
হ্যাড এ গ্রেট ফল
পড়েছে রে মরেছে রে
চল চল চল।
হাট্টি মাটিম টিম
ওরা মাঠে পাড়ে ডিম।
কান হলো ঝালাপালা
শেষ কর এই পালা
ভঙ্গ হোক সভা।
বাহবা! বাহবা!

(১৯৭৪)

আদি যখন বড়ো হবে

আদি যখন বড়ো হবে
চড়বে তখন হাতী।
পাড়ার যত ছেলেমেয়ে
ওরাও হবে সাথী।
ওরা সবাই কী বলবে জানো?
"হাতী!
তোর গোদা পায়ের লাথি।
হাতী!
তোর পায়ে কুলের আঁটি।"

আদি যখন বড়ো হবে
চড়বে তখন ঘোড়া।
পাড়ার যত ছেলেমেয়ে
সঙ্গ নেবে ওরা।
ওরা সবাই কী বলবে জানো?
"ঘোড়া!
কেন চার পা তুলে ওড়া?
ঘোড়া!
চল দুলকি চালে থোড়া।"

(১৯৭৬)

ধিক্ ধিক্ ধিকারি

মুনু মুনু মুনিয়া
শিকারী নয় গো ওরা
ওই সব খুনিয়া।
মেরে মেরে করবেই
বাঘহারা দুনিয়া।

বাঘ ছিল ক্ষত্রিয়
বাঘ ছিল শ্রেষ্ঠ
বীরদের মধ্যে
বাঘ ছিল জ্যেষ্ঠ
মনে ভেবে ব্যথা পাই
বাঘের অদেষ্ট।

চিড়িয়াখানায় গেলে
বাঘ তুমি পাবে না
সুন্দরবনে আর
বাঘ দেখা যাবে না।
বাঘ শেষ হলে কি গো
কেউ পশতাবে না!

ধিক্ ধিক্ ধিকারি!
খুনিয়া ওদের বলে
ওরা নয় শিকারী!

(১৯৭৩)

বাঘকে বাঁচাও

বাঘের বংশ হচ্ছে ধ্বংস
বাঘের জন্যে ভাবি
বাঘকে হবে বাঁচাতে আজ
এই আমাদের দাবী।
বাঘের দেখা আর পাব কি?
বাঘের জন্যে ভাবি।
বাঘের শিকার চলবে না
এই আমাদের দাবী।

ঝড়খালীর বাঘ

বাঘা ঘুমোল পাড়া জুড়োল
শান্তি এল দেশে
ঝড়খালীতে ঝড় থেমেছে
আটাশ দিনের শেষে।

(১৯৭৪)

বাঘবন্দী খেল

ঘুমপাড়ানী গুলী মেরে
        বাঘকে দিল ঘুম পাড়িয়ে
খাঁচায় পুরে রাত দুপুরে
        বাঘকে দিল গাঁও ছাড়িয়ে।
খালে খালে নাও ভাসিয়ে
        অনেকদূরে গেল নিয়ে
বনের মাঝে খাঁচা খুলে
        বাঘকে দিল ফের জাগিয়ে।
বাঘ কি বোঝে ব্যাপারখানা
        কোথা থেকে কোথায় আনা ?
হায় বেচারা বাঘের ছানা
        ফ্যালফেলিয়ে রয় তাকিয়ে।

॥ ২ ॥

বন্দী যদি করলে ওকে
লাভ কী হলো মুক্তি দিয়ে
শক লেগে আর নেশার ঘোরে
খাঁচায় গিয়ে রয় ঝিমিয়ে।
ওটা আরেক বাঘের থানা
সে বাঘ এসে দিল হানা
হায় রে বিকল বাঘের ছানা
মারা গেল জখম নিয়ে।
কত দিন সে পায়নি খেতে
রাখত তারে কে বাঁচিয়ে?
ধরলে কেন ছাড়লে কেন
বাঁচার খোরাক না জুগিয়ে?

(১৯৭৪)

টোগো

বাপের নাম বাচ্চা
মায়ের নাম মেরী আর
কান দুটি তার আচ্ছা
ভালো জাতের বাচ্চা
কালা ধলা টেরিয়ার।

নাম রাখা হয় টোগো
জাপানের সেই হীরো
ডাকে কেমন ঘো ঘো
মহাবীর টোগো
থাকে কেমন ধীর ও।

শেখাই ওকে সার্কাস
মুখে ধরাই লাঠি
খেলাঘরের চার পাশ
দেখাই কেমন সার্কাস
সঙ্গে নিয়ে হাঁটি।

সেদিন বেলা সাতটায়
লাঠি দিলেম মুখে
লাঠি ছেড়ে হাতটায়
সকাল বেলা সাতটায়
কামড় দিল ঠুকে।

হায় রে সে কী ঝকমারি
জলাতঙ্ক রোগ ও
আমার হলো ডাক্তারি
হায় রে সে কী ঝকমারি
মারা গেল টোগো।

সবাই বলে, বিষেই
তোমার কী হয় দেখো
টোগোর সঙ্গে মিশেই
তোমায় ধরবে বিষেই
তুমিও এবার শেখো।

ভয়ে ভয়ে দিন যায়
পাগল না হই শেষটা
কসৌলী না পাঠায়
ভয়ে ভয়ে মাস যায়
সেকালে শেষ চেষ্টা।

বয়স ছিল বছর আট
টোগো ছিল সাথে
বেঁচে আছি বছর ষাট
চুকে গেছে খেলার পাট
দাগ রয়েছে হাতে।

(১৯৭৪)

সানী

বল যদি ছুঁড়ে দাও পুকুরে
সাঁতরিয়ে নিয়ে আসে কুকুরে
তেমন কুকুর ছিল জানি
নাম তার সানী।

খেলোয়াড় খেলা ভালোবাসত
দৌড়িয়ে লুফে নিয়ে আসত
খুব দূরে ছুঁড়ে দিলে ঢেলা
এ বেলা ও বেলা।

অ্যালসেশিয়ানের বাচ্চা
যদিও সে নয় পুরো সাচ্চা
হাঁক ডাক শুনে লাগে কম্প
চোর দেয় ঝম্প।

ছিল তার দেহে যত শক্তি
মনে ছিল তত প্রভুভক্তি
বিরাট, ভীষণ, তবু পোষা
বিপদে ভরোসা।

ভাব ছিল ছোটদের সঙ্গে
লাফালাফি করে কত রঙ্গে
জানে না সে কোনো দুষ্টুমি
যাই বলো তুমি।

সেই সানী নেই আজ ভুবনে
দেখা আর হবে নাকো জীবনে
আহা, কত বিশ্বাসী প্রাণী
আদরের সানী!

(১৯৭৫)
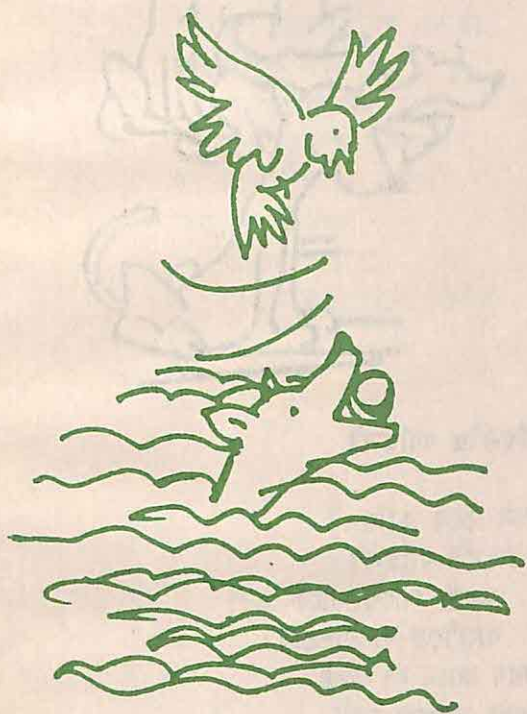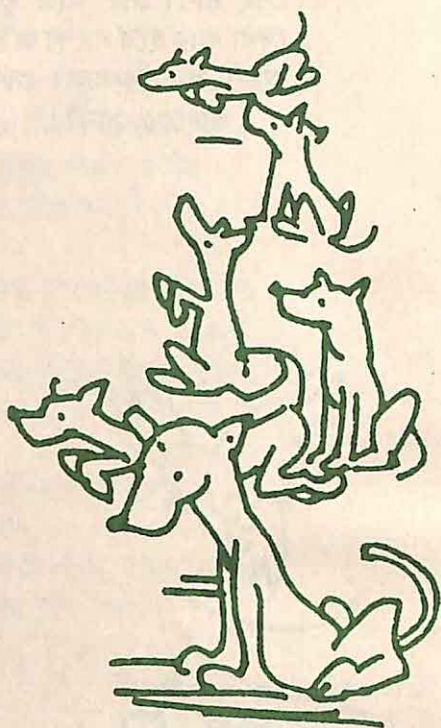
বাহিনীর কাহিনী

শোন তবে কাহিনী
ঘেউ ঘেউ বাহিনী
    আশে পাশে থাকে ওরা
    বাড়ীতে বা রাস্তায়।
কারণ জানে না কেউ
একটা ডাকলে ঘেউ
    সব ক'টা ডেকে ওঠে
    মাঝ রাতে শোনা যায়।

মাটি হয় কাঁচা ঘুম
ভাবি এ কিসের ধুম
   ডাকাত পড়েছে নাকি
   আমাদের পাড়াটায় ?
মনে হয় আমি উঠি
লাঠি নিয়ে ছুটোছুটি
   করে দেখি ডাকাত কি
   চোর যাতে না পালায়।

"চোর! চোর!" রব কোথা?
চার দিকে নীরবতা
   জনমানবের সাড়া
   কান পেতে মেলা দায়।
তা হলে কি সব ফাঁকি
অকারণ ডাকাডাকি
   ডাকাত বা চোর নয়
   ডেকে ওরা সুখ পায় ?

(১৯৭৩)
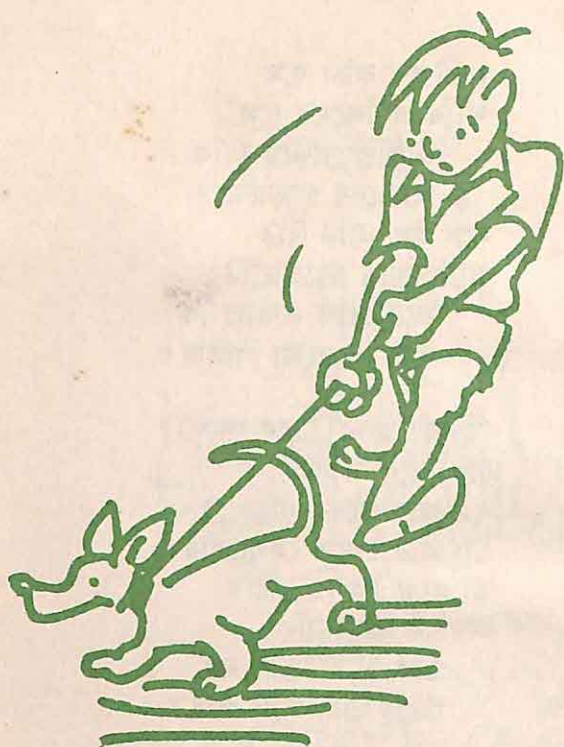
বন্দি

আমার কুকুর নয়
　　কুকুরের আমি
ও টানলে চলি, আর
　　ও থামলে থামি।
বাধ্য আমার নয়
　　তবু ও বিশ্বাসী
ভালোবাসে আমাকে ও
　　আমি ভালোবাসি।

জবাব

শুনে হলেম খুশি
কুকুরের নাম পুষি।
আমার ভাই জগু
বেড়ালকে কয় ডগু।

বোঁজি ছিল ঘরমণি

শুনবে কেমন কেরামত?
সাপকে কেটে দু'খান করে
আবার করে মেরামত।
কত যে নামডাক তার
জন্তুকুলের বৈদ্য সে যে
সার্জন কি ডাক্তার।

লোকে বলে বেঁজি
বেঁজির গুণে মুগ্ধ আমি
নয় সে হেঁজিপেঁজি।
বেঁজি ছিল ঘরমণি
ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়
কী খোঁজে সে ? সর ননী ?

সারাটা ক্ষণ ছটফট
ধরে এনে আদর করি
পালিয়ে যাবে চটপট।
বেশী ঘাঁটাই, কামড়ায়
দাঁতের ধার কী সর্বনেশে
রক্ত বেরয়, হায় হায় !

বেঁজি তো নয়, পাজী।
ইচ্ছে করে শেকল দিয়ে
বাঁধি তারে আজই।
সবাই বলে, না। না।
অমন করে বেঁজি পোষা
শাস্ত্রে আছে মানা।

বেঁজি পোষা কী দায় !
অবশেষে বাইরে নিয়ে
দিতেই হলো বিদায়।

(১৯৭৩)

পিপীলিকার ভ্রমণকাহিনী

পিপ্‌ড়ে গেলেন বৃন্দাবন
পিপ্‌ড়ে গেলেন কাশী
পিপ্‌ড়ে গেলেন হরিদ্বার
প্রয়াগ আর ঝাঁসী।
ঘরের ছেলে এলেন ঘরে
হলেন গৃহবাসী।

তখন তাঁকে ঘিরে ধরে
পিপীলা বাহিনী
ঘরকুণোরা শুনতে চায়
ভ্রমণকাহিনী।
বলেন তিনি, "যেখানে যাই
চিনি কেবল চিনি।"

একমাত্র ঠাকুরমা-ই
বুঝলেন এর মানে
পিঁপড়ে ছিল বন্দী হয়ে
কৌটার মাঝখানে।
কৌটো ছিল পেড়ীর মধ্যে
একান্ত সাবধানে।

চায়ের সময় খোলা হতো
চায়ের পরেই বন্ধ
চিনির তলায় কে যে আছে
কেউ করে না সন্দ।
পিঁপড়ে থাকে সমস্তক্ষণ
চিনির রসে অন্ধ।

(১৯৭৫)

ধাঁধা

কে যেন বলেছিল, "ঠিক ঠিকই ?"
টিকটিকি! টিকটিকি! টিকটিকি!
কার যেন কে ছিল বাবর শা ?
মাকড়সা! মাকড়সা! মাকড়সা!
কে যেন চুষে খায় কার খোকা ?
ছারপোকা! ছারপোকা! ছারপোকা!
সাবাড় করে কে খেয়ে চাল চুলা ?
আরসুলা! আরসুলা! আরসুলা!
ব্যাঙ কাকে বলেছিল, "ঘর নিকা ?"
চামচিকা! চামচিকা! চামচিকা!
বর্ষায় কে করে ঘ্যাঙ ঘ্যাঙ ?
কোলাব্যাঙ! কোলাব্যাঙ! কোলাব্যাঙ!
প্যাঁক প্যাঁক করে কে হাঁসফাঁস ?
পাতিহাঁস! পাতিহাঁস! পাতিহাঁস!
ওত পেতে কে রয়েছে, ওরে বাপ!
সাআআপ! সাআআপ! সাআআপ!

(১৯৭৩)

অবাক চা পান

এক যে ছিল হাবু।
তার যে ছিল ভাইটি, ওর
নামটি ছিল লাবু।
বাবার যিনি বাবা, তাঁকে
ডাকত বাবাবাবু।

বিকেলবেলা নিত্য
চায়ের আসর জাঁকিয়ে বসা
বাবাবাবুর কৃত্য।
জুটত পাড়ার ছেলেবুড়ো
মনিব আর ভৃত্য।

গণতন্ত্র খাঁটি।
কারো হাতে মাটির খুরি
কারো পাথরবাটি।
কারো হাতে পেয়ালা আর
পিরিচ পরিপাটি।

কেই বা থাকে বাকী?
কুত্তাও খায় চেটেপুটে
বিল্লীও চা-খাকী।
দাঁড়ে বাঁধা বুড়ো তোতা
সেও চা-খোর পাখী।

হাবু আর লাবু
জ্বর হলেও খাবে নাকো
বার্লি আর সাবু।
তাদের জন্যে চা বানাবেন
বাবার যিনি বাবু।

বিদ্যে তো লাস্ট কেলাস
চায়ের জন্যে তাদের কিনা
এনামেলের গেলাস।
বন্ধু যারা আসত তারা
গেলাস দেখেই জেলাস।

পাশের বাড়ীর খুড়ো
আফিং খেয়ে নেশায় ঘোরে
আসতেন সেই বুড়ো।
তাঁর হাতে এক কাঁচের গেলাস
আধসেরটাক পুরো।

ক' রে, তোরা ক'!
সুধান তিনি, বর্ণমালায়
ক'টা আছে স?
তিনটে আছে, দু'ভাই বলে,
শ, ষ, স।

উঁহু! উঁহু! উঁহু!
তাকান তিনি মিটিমিটি
হাসেন মুহু মুহু।
বিদ্যেসাগর পড়িস্ বুঝি?
হা হা! হি হি! হু হু!

ক' রে, তোরা ক'
বানান করে গোটা গোটা
গে...লা...স...।
ইংরিজীটা শিখলে পরে
চারটে হবে স!

(১৯৭৫)

আধমণী কৈলাস

আধমণ চাল তার
　　　　এক থালা ভাত
কে খায়? কে খায়?
　　　　কৈলাসনাথ।
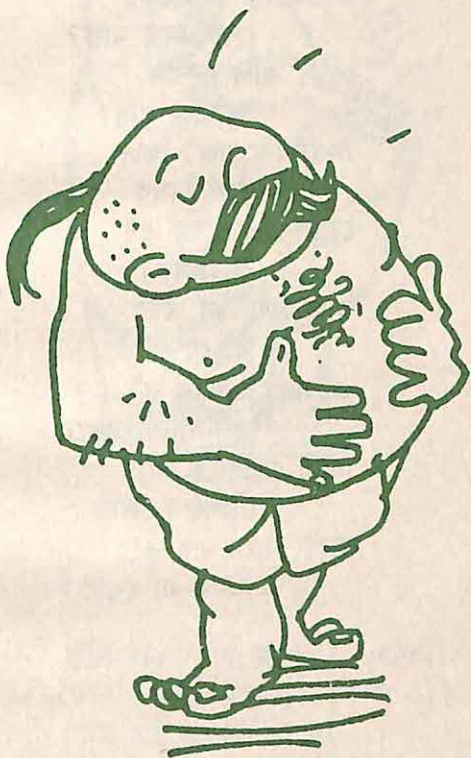
আধমণী কৈলাস
খায় আর কী?
একসের আন্দাজ
ভঁয়সা ঘি।
ঘি দিয়ে ভাত খায়
সঙ্গে কী এর?
অড়হর ডাল খায়
চার পাঁচ সের।
এতেই কি পেটুকের
পেট ভরে যায়?
ঝোল ঝাল অম্বল
মিষ্টিও খায়।
নিরামিষভোজী ছিল
ডাইনোসর
তেমনি এ যুগে এই
কৈলাসর।
আজকাল এই জীব
বাঁচবে কেমনে?
এ বাজারে খাবে কী এ?
কী পাবে রেশনে?
এরই খোরাকে বাঁচে
ত্রিশজন লোক
তাই আমি এর তরে
করব না শোক।

(১৯৭৪)

হিংসুটে

পিসী, তুমি মাসী কেন হবে?
তোমায় ওরা ডাকছে কেন মাসী?
পিসী, তুমি ওদের মাসী হলে
কেমন করে তোমায় ভালোবাসি!

হিংসুটে!
সবাই ওরা হিংসুটে
আমার পিসী নেয় লুটে।
কক্ষনো না!
পিসী তুমি, নও মাসী।

পিসী, তুমি মামী কেন হবে!
তোমায় ওরা ডাকছে কেন মামী?
পিসী, তুমি ওদের মামী হলে
কেমন করে ভালোবাসি আমি!
হিংসুটে!
সবাই ওরা হিংসুটে
আমার পিসী নেয় লুটে।
কক্ষনো না!
পিসী তুমি, নও মামী।

পিসী, তুমি কাকী কেন হবে?
তোমায় ওরা ডাকছে কেন কাকী!
পিসী, তুমি ওদের কাকী হলে
কেমন করে পিসী বলে ডাকি!
হিংসুটে!
সবাই ওরা হিংসুটে
আমার পিসী নেয় লুটে।
কক্ষনো না!
পিসী তুমি, নও কাকী।

(১৯৭৪।

নাও ভাসান

প্রথম যেদিন নামে ঢল
নয়ানজুলিতে আসে জল।
বাড়ীর সামনে দেখি
বাঃ ভোজবাজি এ কি!
নদী বয়ে চলে কলকল
বাড়ীর সামনে হাঁটুজল।

কাগজকে কেটে করি চৌকা
বানাই সাধের যত নৌকা।
তারপর কৌশলে।
ভাসাই নদীর জলে
ছেলেবেলা সে কেমন মওকা
লাল নীল কাগজের নৌকা।

কিছুদূর গিয়ে নাও টোল খায়
আরো দূরে আরেকটা ওলটায়।
নয়নজুলির জলে
সপ্ত ডিঙা চলে
একটি কি পৌঁছবে লঙ্কায়?
বুক করে দুরু দুরু শঙ্কায়।

আমিও যেতুম চলে সঙ্গে
বাইতে বাইতে তরী রঙ্গে।
তখন ছোট্ট আমি
দোরগোড়াতেই থামি।
জল কাদা মাখি সারা অঙ্গে।
বড়ো হলে চলতুম সঙ্গে।

(১৯৭৫)
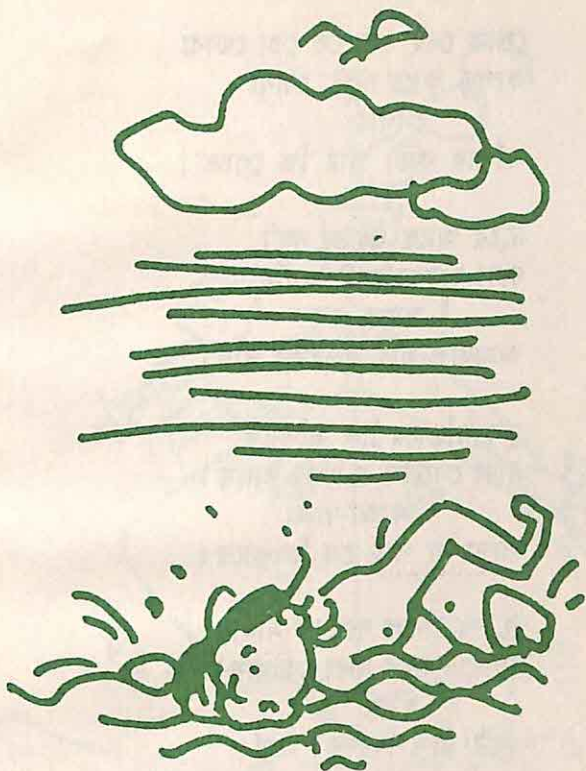
সাঁতার

ধন্যি তোমার বুকের পাটা
সন্ধে সকাল সাঁতার কাটা!
দাদা,
রাত্তিরে দেয় গায়ে কাঁটা।

ডুব সাঁতারে চিৎ সাঁতারে
তোমার সঙ্গে কেউ কি পারে।
চাচা
আপনা বাঁচাই দীঘির ধারে!

স্রোত নেই যার সে তো ডোবা
কাপড় কাচে ঝন্টু ধোবা
সেথায়
সাঁতার কাটা পায় কি শোভা!

দূরে আছে বহতা নদী
দাদা যাবেন সেই অবধি
সাথে
আমরাও যাই, ডোবেন যদি!

ডুব সাঁতারে চিৎ সাঁতারে
দাদা গেলেন চোখের আড়ে।
"দাআ-দাআ"
সাড়া না পাই সে চিৎকারে।

বুদ্ধি খেলে যায় রে মাথায়
দেখতে হবে দাদা কোথায়।
হঠাৎ
উঠে বসি বিদেশী নায়।

দাদা ভাসেন আমরা ভাসি
কাছাকাছি যখন আসি
তখন
দাদার মুখে ফোটে হাসি।

দাদা বলেন, বাঁচালি ভাই
ভবনদীর কিনারা নাই।
ভাবি
পরলোকে হবে কি ঠাঁই!
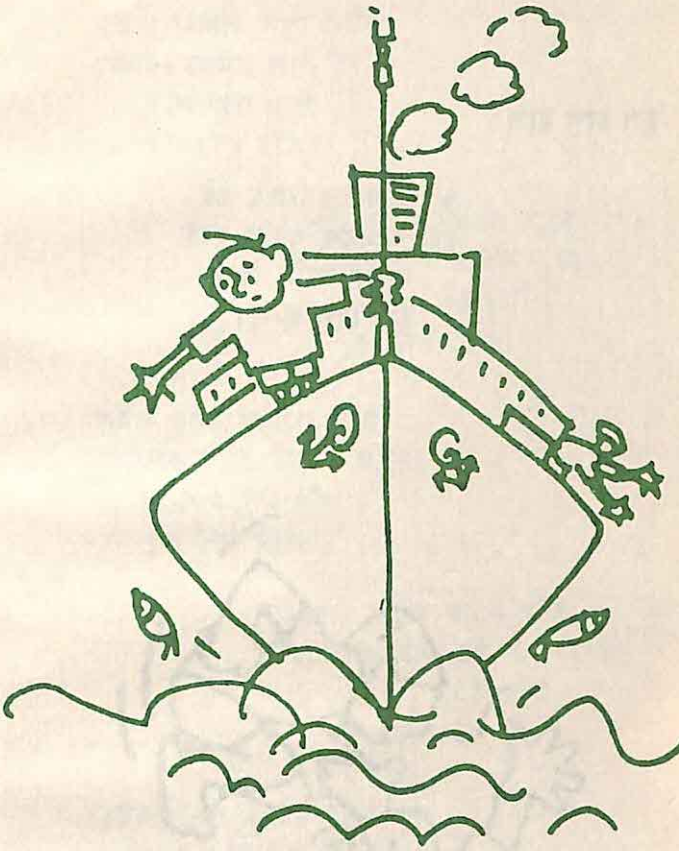
মাঝিরা দেয় পৌঁছে ডাঙায়
দাদা তখন দু'চোখ রাঙায়।
হাঁ রে!
এরই জন্যে টাকা কে চায়!

ফিরে চল দীঘির টানে
দাদা বলেন কানে কানে।
বাব্বা!
আমারও ধড় ফিরল প্রাণে।

(১৯৭৬)

চুপ চাপ হাপ

এই খেলাটার নিয়ম এই
তুই আমাকে ধরবি যেই
মারব আমি লাফ
চুপ চাপ হাপ।
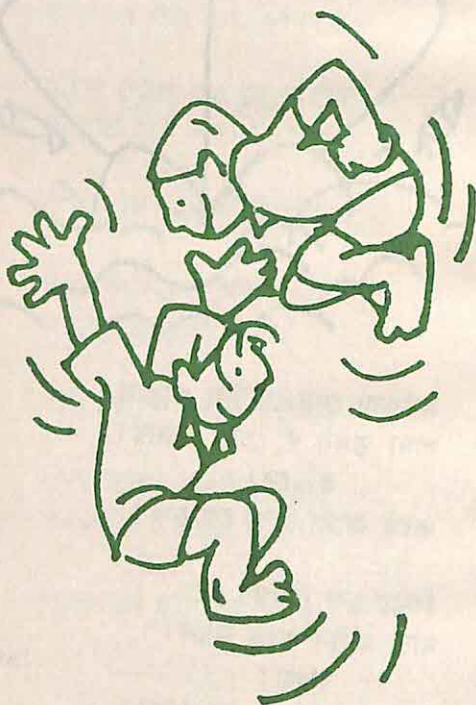
তুইও আমার সঙ্গ নিবি
তেমনি জোরে লম্ফ দিবি
দুপ দাপ দাপ
চুপ চাপ হাপ।

তখন আমি ডাইনে ঘুরে
লাফিয়ে যাব অনেক দূরে
ধাপের পর ধাপ
চুপ চাপ হাপ।

তুইও তখন ডাইনে ঘুরে
লাফিয়ে যাবি অনেক দূরে
ঝাঁপের পর ঝাঁপ
চুপ চাপ হাপ।

এবার আমি ঘুরব বাঁয়ে
লাফিয়ে যাব এক এক পায়ে
লাগবে পায়ে কাঁপ
চুপ চাপ হাপ।

তুইও তখন ঘুরবি বাঁয়ে
লাফিয়ে যাবি এক এক পায়ে
ছাড়বি শেষে হাঁফ
চুপ চাপ হাপ।

(১৯৭৩)
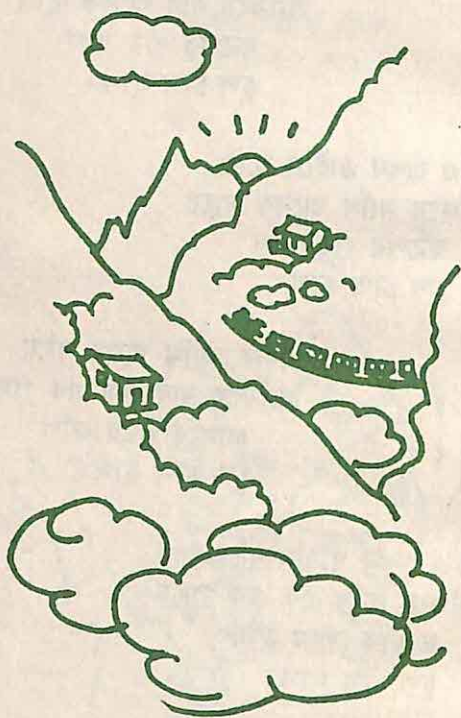
পিং পং

পিং পং
কালিমপং।
ডিং ডং
কালিমপং।
কিং কং
কালিমপং।
সিং সং
কালিমপং।

টিং লিং
দার্জিলিং।
মিং লিং
দার্জিলিং।
শিং লিং
দার্জিলিং।
জিং লিং
দার্জিলিং।

অং বং
কার্শিয়ং।
টং ঠং
কার্শিয়ং।
ডং ঢং
কার্শিয়ং।
রং চং
কার্শিয়ং।

তাসের আড্ডা

খেলব না তো গোলামচোর
সবাই তোরা চালাক ঘোর
গোলাম ধরাস্ হাতে।
যতবারই পাঠাই পাশে
ততবারই ঘুরে আসে
থাকে আমার সাথে।
খেলব না তো গাধার ব্রে
ভুলেও তোরা টানিস্ নে
পেলে আমায় দিবি
যতবারই পাঠাই পাশে
ততবারই ঘুরে আসে
ইস্কাবনের বিবি।
(১৯৭৩)

হাসির বাহার

হো হো হাসি কখন হাসে?
বলটা যখন পায়ে আসে।
হা হা হাসি কখন হাসে?
বল ছুটে যায় গোলের পাশে।
হি হি হাসি কখন হাসে?
বলটা যখন ফিরে আসে।
হে হে হাসি কখন হাসে?
চোখটা যখন জলে ভাসে।

(১৯৭৪)

শতরঞ্জ

কী নাম হে ?
হরি ভঞ্জ।
বাড়ী কোথা ?
হরিগঞ্জ।
খেলাটা কী ?
শতরঞ্জ।
কেন এ খেল্ ?
আমি খঞ্জ।

(১৯৭৫)

ব্যাকরণ

গোঁয়ার আমি, গোঁয়ার তুমি
করছি, দাদা, গোঁয়ার্তুমি।

বাঁদর তুমি, বাঁদর আমি
করছি, ভায়া, বাঁদরামি।

ভাগ্য

রবিবারে জন্মায়
কবি বলে যশ পায়।
সোমবারে জন্ম
তার হয় ধম্ম।
মঙ্গলবারে জাত
বীর বলে বিখ্যাত।
জন্ম কি বুধবার?
বুদ্ধিটি ক্ষুরধার।
বৃহস্পতিবারে জাত
বিদ্বান বলে জ্ঞাত।
জন্ম শুক্কুরবার
আলো করে রূপে তার।
শনিবারে জন্মায়
ধনী হয়ে মান পায়।

(১৯৭৩)

নাই মামা ও কাণা মামা

নাই মামা বললেন
কাণা মামাকে,
"ভাগনে ভাগনী নাই
তাই আমাকে
সংসারে মামা বলে
কেউ না ডাকে।"
কাণা মামা বললেন
নাই মামাকে,
"চোখ যার নাই তার
কী হবে ডাকে!
মামা হওয়া মিছে, যদি
চোখ না থাকে!"

(১৯৭৫)

কখনো না

ভবী কখনো ভোলে ?
না।
হাতী কখনো ঢোলে ?
না।
তিমি কখনো ঝোলে ?
না।
বট কখনো দোলে ?
না।
জট কখনো খোলে ?
না।

(১৯৭৩)

হুকুম

এই ছোকরা!
আলুবোখরা
        আখরোট কিসমিস
চার পয়সায়
যা নিয়ে আয়
        না আনলে—ডিসমিস।

(১৯৭৩)

দু' চক্ষের বিষ

ভালো লাগে কী কী
শুনবি তো শোন তা
ভালো লাগে টক ঝাল
ভালো লাগে নোনতা।
দুই চক্ষের বিষ
যত সব মিষ্টি
দুই চোখ বুজে তাই
খাই ওই বিষটি।

(১৯৭৩)

চুকলি

বুঁচকি, ও বুঁচকি!
তোর ওই পুতুলটা
কেন এত পুঁচকি!

টুকলি, ও টুকলি!
পুতুলের নামে কেন
করছিস চুকলি!

(১৯৭৩)

জাপানেতে যাও যদি

হাসিহাসি তাকাহাসি
বাড়ী তাঁর কিয়োতো।
জাপানেতে যাও যদি
খোঁজ তাঁর নিয়ো তো।

হয়তো বা ভুলে গেছি
বাড়ী তাঁর তোকিয়ো
তোকিয়োতে গেলে তুমি
গাড়ীটাকে রোকিয়ো।

(১৯৭৩)
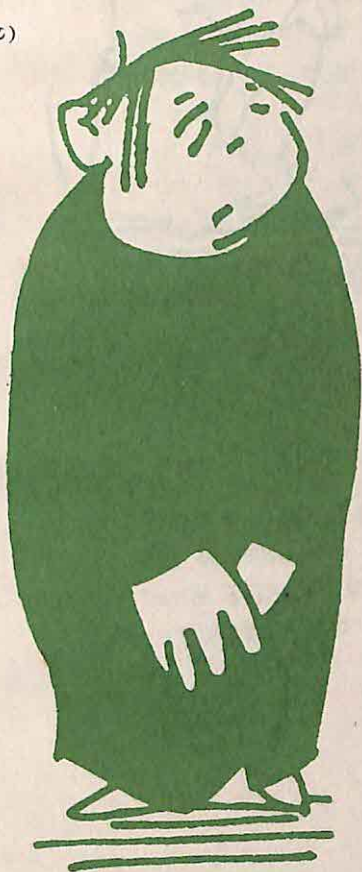
আলাদীন

বিজলীর ধারা এই
এই আছে এই নেই
এর চেয়ে মোমবাতি ভালো
জ্বালো জ্বালো হারিকেন জ্বালো।

করুক না টিমটিম
তেলে ভরা পিদ্দিম
রাতভর সেও দেয় আলো।
জ্বালো জ্বালো পিদ্দিম জ্বালো।

পেতলের দীপ বেচে
আলাদীন ঠকে গেছে
যাদুকর দিয়ে গেছে ফাঁকি
ভোগার কী আর আছে বাকী!

কাঁদে বসে আলাদীন
ডাকলে না আসে জিন
সুইচ টিপলে কই আলো
সোনার প্রদীপ কিসে ভালো!

সুইচ টিপলে হাওয়া
আর তো যায় না পাওয়া
গরমে যে তিষ্ঠনো দায়
আলাদীন করে হায় হায়!

কিনে আনে হাতপাখা
দাম দেয় এক টাকা
হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খায়
হাড়ে তার বাতাস লাগায়।

(১৯৭৪)

আর একটি তারা

পাঁজিতে এক সুদিন দেখে
মহাশূন্যে চলছ কে কে
রকেট চেপে দিচ্ছ কবে পাড়ি!
আমাকে, ভাই, সঙ্গে নিয়ো
ইচ্ছে করে যাই আমিও
বানাই গিয়ে আসমানে এক বাড়ী।

এখানে আর যায় না থাকা
কোথাও নেই জায়গা ফাঁকা
গা মেলবার পা ফেলবার ঠাঁই।
রাস্তা ছিল, তাও খোঁড়া
তলিয়ে যাবে গাড়ী ঘোড়া
মাঠ ছিল, তা দালানে বোঝাই।

মহাশূন্যে বানিয়ে ঘাঁটি
বাইরে করে হাঁটাহাঁটি
মাটি বিনাই মহাকাশচারী।
তাই যদি হয় চল না, ভাই,
ফুটবলটাও নিয়ে যাই
বিনা মাঠেই ছুটব পিছে তারই।

মহাশূন্য খোলামেলা
মহানন্দে করব খেলা
পদে পদে বাধা দেবে কারা ?
এখান থেকে হবে মনে
রাতের বেলা দূর গগনে
বাড়ী যেন আর একটি তারা।

(১৯৭৩)
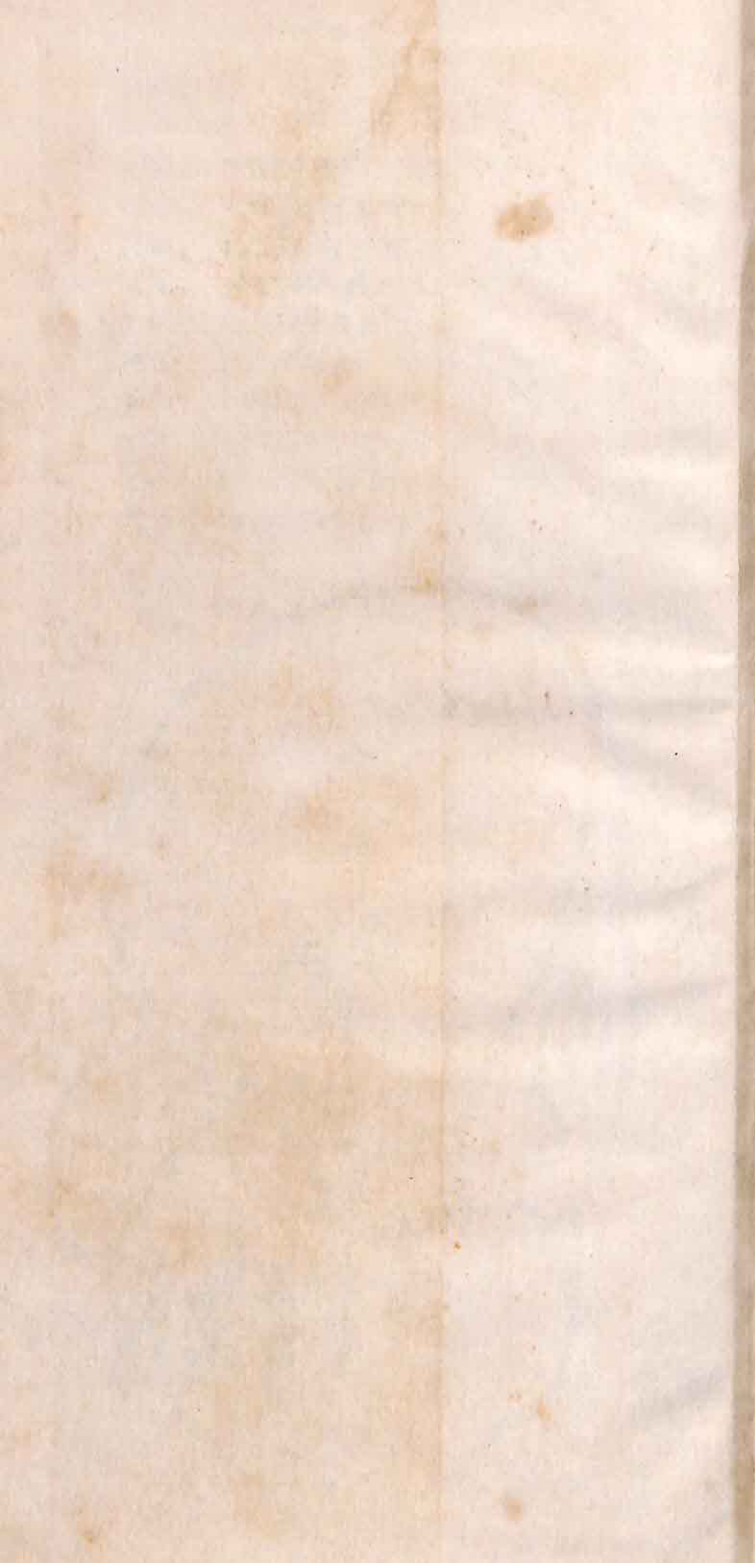
যেমন বড়দের, তেমনি ছোটদেরও যাঁরা অক্লেশে আকর্ষণ করতে পারেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁদের সংখ্যা অবশ্যই বেশী নয়। অন্নদাশঙ্কর সেই স্বল্প সংখ্যকদের অন্যতম। একদিকে যেমন বয়স্ক পাঠকসমাজের হাতে তিনি এমন বহু গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ তুলে দিয়েছেন, ভাষার দীপ্তিতে ও চিন্তার সাহসিকতায় আজও যা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, অন্যদিকে তেমনি ছোটদেরও তিনি দূরে দাঁড় করিয়ে রাখেননি, তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর অসামান্য ছড়ার সম্ভার।

এমন ছড়াও অবশ্য তিনি অসংখ্য লিখেছেন, যা শুধু ছোটদেরই নয়, বড়দেরও সমানে টানে। তাঁর অনেক ছড়া যেমন বিদ্রূপে বঙ্কিম, অনেক ছড়া তেমনি নির্মল কৌতুক ঠাসা। অনেক ছড়া যেমন বড়দের জগতের ভুল, ত্রুটি আর অসঙ্গতিগুলিকে নির্ভুলভাবে ধরিয়ে দেয়, অনেক ছড়া তেমনি আবার ছোটদের খেলাঘরের হাসিটাকেই আরও স্পষ্ট করে, মধুর করে শুনিয়ে দিয়ে যায়।

কিন্তু ছোটদের জন্যই হোক, আর বড়দের জন্যই হোক, সত্যাশ্রয়ী অন্নদাশঙ্করের সমস্ত ছড়াই আসলে সত্যকে ছুঁয়ে থাকে। যেমন তাঁর গল্প উপন্যাস ও প্রবন্ধ সম্পর্কে, তেমনি তাঁর ছড়া সম্পর্কেও সম্ভবত এটাই সবচেয়ে জরুরী কথা।

হৈরে বাবুই হৈ
অন্নদাশংকর রায়